শামসুর রাহমান

গদ্য সংগ্রহ

সম্পাদনা

গৌতম রায়

পুনশ্চ

SHAMSUR RAHAMAN
GADYA SANGRAHA
[*A collection of selected prose of Shamsur Rahaman*]
Edited by Gautam Roy

First Published: November, 2005
Current Edition: January, 2026

Price : ₹ 950/- Only

ISBN : 978-81-7332-458-1

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ২০০৫

বর্তমান সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ : সরোজ সরকার

দাম ₹ ৯৫০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

মুখ্যমন্ত্রী নয়, আমার প্রিয় পাঠক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-কে

সূ চি প ত্র

❑ ভূমিকা ৯-১২

❑ আমার কথা ১৩-১৪

❑ কালের ধুলোয় লেখা ১৫-৩৩২

❑ উপন্যাস ৩৩৩-৪৪৬

অক্টোপাস ৩৩৫ □ অদ্ভুত আঁধার এক ৩৯৫

❑ ছোটগল্প ৪৪৭-৪৮৮

সে, একটি ব্লেড এবং সুরভি ৪৪৯ □ সাযযাদ আমিনের কথা ৪৫৮ □ গাঙচিল ৪৬৮ □ প্রৌঢ়ের প্রব্রজ্যা ৪৭৩ □ বর্ষারাতে নূপুর-ধ্বনি ৪৭৯ □ না রোদ, না জ্যোৎস্না ৪৮৫

❑ নাটক ৪৮৯-৬৩৮

হ্যামলেট (উইলিয়াম শেক্সপিয়র) অনুবাদ

❑ প্রবন্ধ ৬৩৯-৭১০

আমৃত্য তাঁর জীবনানন্দ : পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক কবিতা ৬৪১ □ বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী ৬৪৭ □ কালবেলায় রূপদক্ষ কবি ৬৫৫ □ বুদ্ধদেব বসু, তাঁর সৃষ্টির তীর্থে ৬৬১

শামসুর রাহমানের প্রবন্ধ : নিঃসঙ্গ নির্মাণে যিনি অক্লান্ত, মননে অগ্রসর ৬৬৭ □ বাংলাদেশের উর্দু লেখক সম্প্রদায় ৬৭০ □ একজন স্নিগ্ধ কবি ৬৭২ □ তিনি বেঁচে আছেন অন্যদের সময়ে ৬৭৪ □ আকাশের আড়ালে আকাশ ৬৭৮ □ আমাদের সমাজ এবং লেখকের স্বাধীনতা ৬৮৫

❑ একান্ত ভাবনা ৭১১-৮০২

শিউলি ও কাদের নেওয়াজ ৭১৩ □ অলভ্য বই ৭১৪ □ শুদ্ধতম কবি ৭১৪ □ কামিনী ফুলের সুরভি ৭১৫ □ এই আমার নিয়তি ৭১৬ □ রুটি চাই গোলাপও চাই ৭১৭ □ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার চাদর ৭১৮ □ লিবার‍্যালিজমের ফাঁক-ফোকর ৭১৯ □ সন্তোষকুমার ঘোষের বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য ৭২১ □ আত্মজীবনী লেখার সাহস ৭২৩ □ যখন ভেঙে গেল কাঁটাতারের বেড়া ৭২৪ □ মুক্তির আলোয় উদ্ভাসিত স্বদেশ ৭২৭ □ আনন্দ ও দুঃখের হাত ধরাধরি ৭২৮ □ কথাশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায় ৭২৮ □ শীতের পিঠে ৭২৯ □ বেদনার পরপারে নজরুল ৭৩০ □ অনিদ্র রাতের জন্য বড় সাধ ৭৩১ □ স্মৃতির রত্নভাণ্ডার ৭৩১ □ গালিবের কাব্যমৃগ ৭৩৩ □ বঙ্গীয় শব্দকোষ ৭৩৫ □ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৭৩৬ □ আমার স্কুলের

মাস্টারমশাই ৭৩৭ □ সাহিত্যিক আড্ডা ও কবিকণ্ঠ ৭৩৮ □ সার্তর আত্মচরিত ৭৩৯ □ মধুসূদনের সমাধি ৭৪১ □ তিতাস একটি নদীর নাম ৭৪৩ □ মোহিতলাল মজুমদার বিষয়ে ৭৪৫ □ পাবলো নেরুদা, তাঁর মনোজ সওগাত ৭৪৫ □ বুদ্ধিবৃত্তির বলয়ে এক সুদক্ষ কবি ৭৪৯ □ কত ঘরে ওঠে হাহাকার ৭৫১ □ লেখকের জীবিকা ৭৫৩ □ অসাধারণ বিনয়ী গোপাল হালদার ৭৫৪ □ ট্রেডমার্ক সৈয়দ মুজতবা আলি ৭৫৬ □ বুদ্ধদেব বসু, তাঁর বাক্যের বাগান ৭৫৮ □ নিঃসঙ্গ গোধূলিতে অসামান্য বন্দী ৭৬১ □ মেঘের পরে মেঘ জমে আঁধার করে আসে ৭৬২ □ মনে রেখো, তবু মনে রেখো ৭৬৪ □ নাটক নাটক আরো নাটক ৭৬৬ □ ডিসেম্বর মাসেই এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ৭৬৮ □ ব্যাকরণ মানা না-মানার ভাবনা ৭৭০ □ তিনি, তাঁর লেখায়, আচরণে ৭৭২ □ নীল মাছি, স্মৃতি, অভিনয় ইত্যাদি ৭৭৪ □ স্বল্পায়ু লেখক ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৭৭৬ □ এই জেনারেশনের গ্যাপ ৭৭৭ □ স্মৃতিতে ভাস্বর তিনি ৭৮০ □ আনিসুজ্জামানের মুনীর চৌধুরী ৭৮১ □ রবীন্দ্রনাথ মনের মহলে ৭৮৩ □ পঁচিশে বৈশাখ ৭৮৪ □ বার্গম্যানের ছবিতে মানুষের শাশ্বত অন্বেষা ৭৮৫ □ ব্যথাবিষে নীলকণ্ঠ কবি ৭৮৭ □ সেই অসামান্য হাত ৭৮৯ □ অবিস্মরণীয় আগন্তুক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯১ □ সেই অলৌকিক কারখানা ৭৯৩ □ একজন অযান্ত্রিক চিত্রকর ৭৯৫ □ গোধূলির বন্দী এখন মুক্তির আকাশে ৭৯৭ □ এই শহরে বহুদিন ৭৯৯ □ আমার ছোট ঘর ৮০১

❑ কবিতা এক ধরনের আশ্রয় ৮০৩-৮৮৪

প্রেম এবং কবিতা ৮০৫ □ কবিতা এক ধরনের আশ্রয় ৮০৮ □ আমার বনলতা সেন ৮১১ □ কী করে ‘বন্দী শিবির থেকে’ লিখেছি ৮১৪ □ আমার জন্মশহর, স্মৃতির শহর ৮১৭ □ কবিতায় সমাজচিন্তা ও কাব্য-ভাবনা ৮২০ □ সাম্প্রতিক কাব্যধারা ও বাংলা কবিতা ৮২৩ □ লেখকের শত্রুগণ ৮২৬ □ জসীমউদ্দীন ৮২৯ □ রূপনারাণের কূলে কিছুক্ষণ ৮৩২ □ পান্থজনের সখা ৮৩৫ □ অসামান্য মানুষ : অরুণ মিত্র ৮৩৮ □ কামরুল হাসান : তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য ৮৪১ □ ‘কংকাল’-এর কবির স্মৃতির উদ্দেশে ৮৪৫ □ শওকত ভাই, ভালোই আপনি এখন নেই! ৮৪৯ □ একজন মহীয়সী নারীর প্রতিকৃতি ৮৫২ □ একজন অসামান্য কবির প্রতিকৃতি ৮৫৬ □ একজন বিস্মৃতপ্রায় লেখকের কথা ৮৬১ □ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তাঁর কবিতা ৮৬৪ □ একজন কৃতী, অথচ অবহেলিত কথাশিল্পী ৮৬৮ □ বাংলাদেশে আধুনিক কথাসাহিত্যের জন্মোৎসব ৮৭২ □ সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া, গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া ৮৭৬ □ ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে ৮৭৯ □ তাঁদের অবদানের অসম্মান যেন না করি ৮৮২

❑ স্মৃতিচারণ [স্মৃতির শহর] ৮৮৫-৯৩৮

❑ চিঠিপত্র ৯৩৯-৯৪৮

❑ সাক্ষাৎকার ৯৪৯-৯৬০

ভূ মি কা

জীবনের কবি শামসুর রাহমান তাঁর আত্মজৈবনিক রচনার প্রায় সূচনাপর্বে বলছেন, ''আহ্ বেঁচে থাকা। এই বেঁচে থাকার জন্যে কত খেসারতই না দিতে হয় আমাদের, ... প্রলোভনের ফাঁদ পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি, তবে, আজ পর্যন্ত অসৎ উপায় অবলম্বন থেকে নিজেকে দূরে রেখেছি, জীবনের বাকি দিনগুলো সততার সঙ্গে কাটিয়ে যেতে পারলে ধন্য মনে করবো।'' জীবনী লেখা কঠিন, আত্মজীবনী লেখা আরও কঠিন। সেই কঠিনতম কাজটির গহীনে কবি যখন প্রবেশ করছেন তখন ধীরে ধীরে ব্যক্তি এবং ঘটনাপ্রবাহের পারস্পরিক সম্পর্কের নিরিখে অচিরেই তা হয়ে উঠছে 'কনফেশন্স'। কবির এই আত্মকথনের ভঙ্গি যেন চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে লেখা সেন্ট অগাস্টিনের আত্মজৈবনিক কথকতার বিংশ শতকীয় এক অনুবর্তন। শামসুরের কাম্য, 'মুক্ত চিন্তাসমৃদ্ধ, শোষণ মুক্ত, অসাম্প্রদায়িক সমাজ', সেই সমাজের প্রতীক্ষায় তিনি রয়েছেন। তাঁর এই থাকা কিন্তু কিছুটা সংশয়ী চিত্তের মধ্যেই জীবনতরী বয়ে চলা। কারণ, কবির ভাষায়; 'সেরকম সমাজের প্রতীক্ষায় আছি, জানি না দেখে যেতে পারবো কিনা। যে দাঁতাল, স্থূল সময়ে আমরা বাস করছি তার অবসান সহজে ঘটবে বলে মনে হয় না, যদি কোনোদিন হয় তাহলে আমাদের লড়াই একেবারে ব্যর্থ হয়নি। একথা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো স্বীকার করবে।' এ যেন বিশ্বনাগরিক কবি অমিয় চক্রবর্তীর কথাই ধ্বনিত হয়েছে; ''যাবার সময় কত দূরে জানি না, কিন্তু এই বেলা বলতে চাই ভূমিকা আমার শুধু এই। যা লিখেছি তারই মৃত্তিকায় গড়া প্রদীপ রইলো, আরো দু-সন্ধ্যা তুলসী তলায় জ্বলুক। যদি আমার ভাগ্যে থাকে।''

শামসুর রাহমানের নির্বাচিত গদ্যের প্রারম্ভিক পর্বে 'কালের ধুলোয় লেখা' কবির আত্মকথন তাই নিছকই ব্যক্তি শামসুরের স্মৃতিকথা নয়। কবি এখানে তাঁর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন নিজের আত্মবিকাশের ঘটনাক্রম। ঘটনার পরতে পরতে জড়িয়ে থেকেছে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যেসব ব্যক্তিত্বেরা তার চলার পথের দিনগুলিতে কান্নাহাসির দোল দিয়ে পৌষ-ফাগুনের পালা রচনা করেছেন সেইসব মানুষজনেরা এসেছেন ফিরে ফিরে। প্রথম মহাযুদ্ধের বারুদের গন্ধ মিলিয়ে যাচ্ছে, দেশকালের গণ্ডির চেতনায় উদ্দীপ্ত হচ্ছে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী প্রবল সংগ্রাম, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ভাঙাগড়া বাংলার সামাজিক প্রেক্ষিত-কে এক আত্মঘাতী পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে — এমন একটা সময়ে পুরনো ঢাকার মাহুৎটুলির সরু গলিতে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখা শিশুটি তাঁর আত্মকথনে যেন, 'তারি আবেশ লাগে মনে বসন্তবিহ্বল বনে'তে অতীতের বিরহী মূর্তিকে বেহাগের তানে উপলব্ধি করেছেন। 'বেহাগ' বড়ো প্রিয় রাগ ছিল রবীন্দ্রনাথের, সেই রাগের মূর্ছনায় তিনি রচনা করেছিলেন; 'চিরসখা হে ছেড়ো না ছেড়ো না মোরে'। কালের ধুলোয় লিখতে বসে গোটা আত্মকথনেই তেমন 'বেহাগ' সৃষ্টি করেছেন শামসুর। জীবনের সংকট, মুক্তির অন্বেষণ, পরিত্রাণের কাহিনি — এসব মিলিয়ে কবির আত্মকথন এখানে হয়ে উঠেছে জন বানিয়ানের 'গ্রেস এ্যাবাউন্ডিং টু দি চিফ অব সিনার্স' (রচনাকাল ১৯৬৬) -এর মতোই একটি মহৎ সৃষ্টি।

শামসুর তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। বছরের শেষে কবির ছোটোভাই রফিক আর ছোটোবোন নেহা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। কবির ভাষায়; ''রফিক বেঁচে গেল, কিন্তু নেহারের মৃত্যু হল এক দুপুরে। আমি স্কুলে ছিলাম। আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করেনি, ডেকেও নিয়ে যায়নি। বসন্ত যাকে দংশন করে তার লাশ বেশিক্ষণ ঘরে রাখা যায় না। বুঝি তাই তাড়াহুড়ো করে নেহারকে কবর দেওয়া হয় আজিমপুর গোরস্থানে। নেহারের মৃত্যু আমাকে খুব বিচলিত করে। শীতবিকালে স্কুল থেকে ফিরে এসে সব শুনে বুক ঠেলে উঠে আসা কান্না থামাতে পারিনি অনেকক্ষণ। নেহার দেখতে ছিল ফুটফুটে, সুন্দর। বসন্তের হিংস্র আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে একটি কলি।'' এই বেদনায় ভরে ওঠা পেয়ালাই শামসুর রাহমানের কাব্যসৃষ্টির প্রথম প্রেরণা ছিল। এই আজিমপুরেই এখন চিরশান্তিতে শয়ান রয়েছেন বঙ্গজননী সুফিয়া কামাল, এখানেই শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন শালাম বরকত, যাঁদের সমাধি-জিয়ারত করতে গেলে খুঁজে নিতে হয় সমাধি ফলক।

আত্মকথনেই গদ্যশিল্পী হিসেবে শামসুরের শৈল্পিক সত্তা তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'কালের ধুলোয় লেখা'কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের আত্মজৈবনিক সৃষ্টি 'দি প্রিলিউড'-এর সাথে একই বন্ধনীভুক্ত করে দেয়। শৈশব থেকে অভিজ্ঞতার চড়াই উৎরাইয়ের ভিতর দিয়ে মাহুতটুলির বাচ্চুর শামসুর রাহমান হয়ে ওঠার এই ধারাবিবরণী প্রাসঙ্গিকতার দিক থেকে ঠিক দুশো বছর আগে শেষ করা ওয়ার্ডসওয়ার্থের আত্মকথনের সাথে একটা আশ্চর্য মোহিনীময় সেতুবন্ধন রচনা করেছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর আত্মকথনমূলক কাব্য 'দি প্রিলিউড' লেখা শেষ করেছিলেন ১৮০৫ সালে, যদিও সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫০-এ। শামসুর বিংশ শতকের শেষ প্রান্ত থেকে আত্মকথন লিখতে শুরু করে তা শেষ করেছেন একবিংশ শতকের প্রারম্ভিক পর্বে এসে। এই আত্মকথনের মধ্যে সাল, তারিখ ইত্যাদির হিসেব ধরা বিষয়গুলি সেভাবে ঠাঁই পায় নি। কবিসত্তার স্বাভাবিক ছন্দেই হয়তো ওরকম সাল, তারিখ, তিথি-নক্ষত্রের ফুটনোট সম্বলিত আত্মকথন শামসুর রাহমানের কাছ থেকে পেলে পাঠক-কে তেমন একটা পরিতৃপ্তিও দিতে পারত না। কিন্তু কোনো আত্মকথন নয়, এই নির্বাচিত গদ্যসংগ্রহে কবিকৃত উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে কাব্যিক সুষমা নিয়ে শামসুর রাহমান উপস্থিত থেকেছেন তা নিঃসন্দেহে পাঠকের কাছে আর একটি ভিন্ন আঙ্গিকের শামসুরকে উপস্থাপিত করবে। এপার বাংলার মানুষ যেহেতু কবির গদ্যসৃষ্টির সঙ্গে সেভাবে পরিচয়ের সুযোগ পাননি, তাই এই সঙ্কলন এপার বাংলার মানুষদের কাছে একটা নতুন দ্যোতনার সৃষ্টি করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শামসুরের আত্মকথনে 'Courtly Love' এসেছে তাঁর কাব্যের মতোই। সময়ের অভ্রান্ত টিপছাপ রাখতে রাখতেই একাদশ শতকের শেষদিকে কিংবা দ্বাদশ শতক জুড়ে ফরাসি দেশের চারণ কবিরা যেমন অভিজাত উন্নত প্রেমের গান গেয়ে যেতেন শামসুরের গদ্যেও পাঠক তেমনটাই পাবেন। আত্মকথনে কবি বলেছেন; ''আজ গৌরীর সঙ্গে বেশি কথা হয়নি। সকালের দিকে লোকজন এলে আমার অসুবিধা হয়। ছিন্ন হয় ওর সঙ্গে যোগাযোগ। আমার মেজাজ খিঁচড়ে যায়। কিন্তু হাসিমুখে অতিথিদের স্বাগত জানাই। আমাদের দেশে আগে থেকে এত্তেলা না দিয়ে চলে আসাটাই যেন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে একধরনের অস্থিরতা নিয়ে আছি, একটা বেদনাবোধ ঘুরে ঘুরে একা একা কথা বলছে আমার সঙ্গে একান্ত নিভৃতে। ওর অভিমান এবং যন্ত্রণা আমাকে স্পর্শ করেছে গভীরভাবে।'' কবির এ হেন আত্মমূর্ছনা অনুভূতিপ্রবণ পাঠককে সাহিত্যপাঠের আন্তর্জাতিক দরবারে হাজির করে দেয়। 'গাওয়েন অ্যান্ড

দি গ্রীন নাইট' ইংরাজি সাহিত্যের এই অপূর্ব রোম্যান্সকে মনে করিয়ে দেয় কিংবা চসারের 'ট্রয়লুস অ্যান্ড ক্রেসিড'কে। ফরাসি দেশের দক্ষিণভাগ থেকে একদিন যেমন এই কোর্টলি লভ ছড়িয়েছিল সে দেশের উত্তরপ্রান্ত থেকে শুরু করে ইতালি, জার্মানি এমনকি ইউরোপের উত্তর প্রান্তেও, তেমনই শামসুর পরবর্তী প্রজন্মের কবিরা একে অনুসরণের প্রচেষ্টা চালালেও শামসুরের সৃষ্টিতে যে শোভনতার পরিচয় মেলে তেমনটা তাঁর সমকাল বা উত্তরকালেও অনেকক্ষেত্রেই মেলে না।

এই গদ্য সংগ্রহের প্রতিটি পৃষ্ঠাতে শামসুরের সৃষ্টির ভিতর যে ডেকোরাম দেখা যায় তা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের সাহিত্যিকদের, কবিদের রচনার ভিতর একটি অনন্যতার দাবি রাখে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে রোমান কবি হোরেস তাঁর অনুপম সৃষ্টি 'আর্ট অব পোয়েট্রি'তে যে শোভনতার তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন অন্নদাশঙ্করের মতো মরমি শিল্পীর কাছে তা অনুকরণীয় হলেও জীবনশিল্পীর পথ-সংকেতকে অনেকেই কিছুটা গাজোয়ারিভাবে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন। গভীরভাবে শামসুরের সামগ্রিক সৃষ্টিকর্মের দিকে নজর দিলে বোঝা যায় যে, কবিতার মতো গদ্যশিল্পের ক্ষেত্রেও তিনি কিন্তু কোনো সময়েই সে পথ দিয়ে হাঁটেননি। শামসুরের সামগ্রিক সৃষ্টিতে হোরেসের দিকনির্দেশের একটা আশ্চর্য সুষমাময় পদশব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

শামসুর তাঁর জীবনেও যেমন মিলনান্তক ঘটনার সঙ্গে বিয়োগান্তক অধ্যায়ের কোনো সংযোগ ঘটান নি, সেইরকমটাই তিনি নিজের গোটা সৃষ্টিতেও কমেডির সাথে কখনো ট্রাজেডির মিশ্রণ ঘটান নি। নিজের চেতনার সুরটিকে চিরদিন যেমন তিনি খুব উঁচু তারে বেঁধে রেখেছিলেন ইশতিয়াক হোসেন কিংবা শারমিন বা নাদিম ইউসুফ — শামসুর সৃষ্ট এইসব চরিত্রগুলিরও মেজাজটা এমনই একটা উঁচু তারে বাঁধা যে ওইসব চরিত্রগুলির সংলাপের ভিতরেও তাদের অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষা সব সময়ে উচ্চারিত হয়েছে। এই উচ্চারণের ভিতর দিয়ে শামসুরের ধর্মনিরপেক্ষ মননের একটা অনিন্দ্যসুন্দর পরিচয় ফুটে ওঠে। 'অক্টোপাস' উপন্যাসে সেই দ্যোতনা থেকেই লেখা হচ্ছে; ''ইশতিয়াক ধর্মমনস্ক নয়, নামাজ পড়ে না। রোজাও সে রাখে না, ইয়াসমিন নিয়মিত রোজা রাখে। তবে তার নামাজ পড়াটা অনিয়মিত। তার গৃহিণী শত চেষ্টা সত্ত্বেও পুরোপুরি পাঞ্জেগানা নামাজের পসন্দ হতে পারে নি। কোনো কোনোদিন তার নামাজ কাজা হয়ে যায়। কিছুদিন লাগাতার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ইয়াসমিন, তারপর ভাঁটা পড়ে উৎসাহে। কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠান সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

ইশতিয়াক ধর্মমনস্ক না হলেও, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভোরের আজান শুনতে ভালো লাগে তার। ছেলেবেলায় আরো বেশি ভালো লাগত। ইশতিয়াকের মনে পড়ে, ওর আব্বার বন্ধু জনাব আব্দুল হাকিম খুব সুন্দর আজান দিতেন। ভদ্রলোকের সুরেলা কণ্ঠস্বর আজও তার কানে বাজে। জনাব আব্দুল হাকিমের হাসিটিও ছিল মধুর। চোখদুটো নেচে উঠত হাসির ঝিলিকে, যেন চোখ দিয়ে হাসছেন তিনি। তার আব্বার বন্ধু ইশতিয়াককে চার্লস ল্যাম্বের 'টেলস ফ্রম শেক্সপিয়র' বইটি উপহার দিয়েছিলেন। কৈশোরে ওই বই ছিল ওর নিত্যসঙ্গী।''

অস্ত্রে বিশ্বাস না রাখা কবির এই চেতনালোক বুঝিবা গড়ে উঠেছিল তাঁর শৈশব, কৈশোরের দিনগুলিতেই। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশির ভিতর নিজের সৃষ্ট চরিত্র ইশতিয়াকের মতো কবি কখনও আবদ্ধ হয়ে থাকেননি। এই নির্বাচিত গদ্য সংগ্রহের অন্তর্গত

‘স্মৃতির শহর’-এ কবি লিখছেন, ‘‘মুহররমের মিছিল সবচেয়ে ভালো লাগতো চকে। মাঝরাতের মিছিল, নানীর সঙ্গে যেতাম চকবাজারের একটা বাড়িতে রাত্তিরে মিছিল দেখবো বলে। নানি বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন আর আমি মিছিলের জন্য অপেক্ষা করে ঝিমুতাম। কখন ঘুমপাড়ানী মাসিপিসি তাদের রূপালী সোনালি পাখা দুলিয়ে সবচেয়ে মিষ্টি একসুরে গান গাইতে গাইতে হাজির হতেন চকের সেই বাড়িটার আঁধার ভরা বারান্দায়, টের পেতাম না।’’...

গদ্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে স্বদেশ, স্বকালের রাজনৈতিক ধারাপ্রবাহকে বারবার ছুঁয়ে গেছেন শামসুর। মুসলিম জাতীয়তার কফিনে পেরেক পোঁতার প্রথম পদক্ষেপ ’৫২র ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, ’৫৪র নির্বাচন, সেই নির্বাচনে দেশভাগের মাত্র সাত বছরের মাথায় মুসলিম লিগের শোচনীয় পরাজয়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়বার্তা ঘোষণা --- এসবই কবিকৃত গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুরে ফিরে এসেছে। কবির চেতনায় ধ্রুব নক্ষত্রের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপস্থিতিও স্ব-মহিমায় তাঁর গদ্যসাহিত্যে ভাস্বর। অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবমুক্তির জন্যে কাকুতি, সাম্যের জয়গান গাওয়া কবি তাঁর সার্বিক জীবনসত্তার প্রায় প্রতিটি অভিব্যক্তিকেই নিজের বিভিন্ন সৃষ্টির ভিতরে উজাড় করে দিয়েছেন। শেক্সপিয়রের ‘হ্যামলেটে’র অনুবাদের ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যিক পরিভাষায় যাকে ‘জাঁর’ (Genre) বলা হয়, আধুনিক সাহিত্যিক রীতিকে অনেকে ‘ফর্ম’ বলেন তাকে এক অননুকরণীয় ভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন পলোনিয়াসের মুখের ভাষায়, ‘‘এরা পৃথিবীর সেরা অভিনেতা। কী বিয়োগান্ত, কী মিলনান্ত, কী ঐতিহাসিক, গ্রাম্যযাত্রা বলুন, গ্রাম্যযাত্রা- কৌতুকী, ঐতিহাসিক গ্রাম্য যাত্রা, বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক, বিয়োগান্ত কৌতুকী, ঐতিহাসিক গ্রাম্যপালা, একটানা দৃশ্য বলুন কিংবা অন্তহীন কবিতা—সবকিছুতেই সমান দক্ষ এরা। সেনেকা এদের কাছে তেমন গুরুগম্ভীর নয়, প্লুটাসও নয় হালকা। ধ্রুপদী কিংবা রোমান্টিক যেকোনো ধরনের নাটকেই এরা দড়।’’ — শেক্সপিয়র লিখেছিলেন, ‘‘tragedy, comedy, history, pastoral, pastoral-comical, historical-pastoral, tragical-historical, tragical-comical-historical-pastoral. ’’ — এভাবেই বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে বাঙালিকে উপস্থাপিত করেছেন শামসুর। কবির এই সুবৃহৎ গদ্য সংগ্রহটিও কাব্যের মতোই ‘পুনশ্চ’র কর্ণধার সন্দীপ নায়ক দৃশ্যপটের আড়ালে থেকে আমায় অন্তহীনভাবে সাহায্য করে গেছেন। তাই কাব্যসংগ্রহের মতোই গদ্যসংগ্রহটিও কার্যত সন্দীপ আর আমার যৌথ সম্পাদনা। কবির পুত্রবধূ টিয়া রাহমান এই কাজে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এসবের পাশাপাশি এই কাজটি করার ক্ষেত্রে শামসুর অনুরাগী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণা আমাদের শক্তি সঞ্চার করেছে। ‘পুনশ্চ’র প্রত্যেকটি কর্মী, বন্ধু যেভাবে ‘কঠিন, কঠোর উদ্ধত অসহায়’ পরিশ্রম করে এই গ্রন্থটিকে দিনের আলোয় নিয়ে এলেন নিছক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের প্রতি কর্তব্য শেষ করা যায় না। তাঁদের জন্য রইল হৃদয়ের উষ্ণ অভিনন্দন। অখণ্ড বাঙালি জাতিসত্তায় বিশ্বাসী, বাংলাপ্রেমী পাঠক সমাজের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় শামসুর রাহমানের এই নির্বাচিত গদ্যকে নিবেদিত করা হল।

ভাটপাড়া
২৩ অক্টোবর, ২০০৫

গৌতম রায়

আমার কথা

বুদ্ধদেব বসু পঞ্চাশোর্ধ বয়সে একটি কবিতায় লিখেছেন, 'কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর।' আমি ষাটের কোঠায় পা রেখেছি; তাই আমার পক্ষে আরো বেশি কঠিন কোনো কিছু করা। সামান্য, তুচ্ছ কোনো কাজও কষ্টসাধ্য মনে হয় আজ। সবচেয়ে মুশকিল নিজের বিষয়ে লেখা। তবু এই দুরূহ কর্মে নিয়োজিত হয়েছি নিষ্ঠাবান সম্পাদক মীজানুর রহমানের নাছোড় তাগিদে।

কী লিখবো? কীভাবে শুরু করবো? আর শুরু করবোই বা জীবনক্ষেত্রের কোন্ বিন্দু থেকে? এইসব প্রশ্ন আমাকে এই মুহূর্তে, অত্যন্ত বিব্রত করছে। কখনো নিজেকে দেখতে পাচ্ছি শৈশবের মাঠে, কখনো-বা যৌবনের জ্বলজ্বলে প্রান্তরে। নিজের অজান্তেই বুক চিরে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘশ্বাস। চাওয়া না-চাওয়া, পাওয়া না-পাওয়ার হিসেবে মেলানোর আগ্রহ নেই। দেখতে-দেখতে, চোখের পলক না পড়তেই জীবন হেমন্ত গোধূলিতে এলিয়ে পড়লো, এ-কথা ভাবতেই মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয়, এতকাল পরে দুঃখ ছাড়া অন্য কিছু অর্জন করিনি। কখনো কখনো বেদনাঘন মুহূর্তে প্রশ্ন করি, কেন এলাম এই পৃথিবীতে? মরতে যখন হবেই, তবে কী লাভ মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে? কিন্তু আমাদের এই গ্রহে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য আমি নিজে দায়ী নই। একজন পুরুষ এবং একজন নারীর কিছু উদ্বেলিত মুহূর্তের পরিণাম আমি, যে-নবজাতক আমি স্বাভাবিক জীবন-তৃষ্ণায় শোষণ করেছিলাম মাতৃস্তন্য। তারপর পিতামাতার অপরিসীম স্নেহ ও পরিচর্যায়, পরিবেশের সংস্পর্শে, নিজের কাজে-অকাজে ক্রমাগত হয়ে উঠেছি আজকের এই আমি। প্রায় বুড়ো, যদিও আমার তরুণ কবিবন্ধুগণ প্রায়শ বলেন যে, আমার সত্তা থেকে নাকি তারুণ্য মুছে যায়নি আমার নড়বড়ে স্বাস্থ্য সত্ত্বেও।

আগে বলেছি, দুঃখ ছাড়া অন্যকিছু অর্জন করিনি। না, নেমক-হারামি করবো না; জীবন কিছু কিছু সুখও আমার ভাণ্ডারে তুলে দিয়েছে। অনেকের প্রীতি ও শুভেচ্ছা পেয়েছি জীবনযাত্রার পাথেয় হিসেবে। আমার প্রীতিসাধনের কেউ কেউ এত যত্নবান হয়েছেন, অনেকে আমার সংস্পর্শে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণে অকৃপণ থেকেছেন এত বেশি যে, নিজেকে তার যোগ্য মনে করতে কুণ্ঠিত হয়েছি বার বার। যা হোক, আমার শুভার্থীদের কাছে আমৃত্যু কৃতজ্ঞ থাকবো।

বাংলা ভাষা আমার সবচেয়ে প্রিয়। ভাষা নিয়েই আমার প্রধান কাজ, যেহেতু যৌবনের ঊষাকালে কবিতা লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছি, সে তার সব রহস্য আমার কাছে উন্মোচন করেছে, এমন দাবি করবো না। তবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, যদি সুস্থতার প্রশ্রয় পাই, মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত থাকবো, আশা করি। আমার কবিতার বইয়ের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। তাই, বলা যেতে পারে, অন্য যে-কোনো ব্যাপারে আলস্য আমাকে

যত বেশি দখলই করুক, কবিতা রচনায় আমি এখনো অনলস। সিদ্ধি নিয়ে মাথা ঘামাই না, তা বিচারের ভার পাঠক, বোদ্ধা ও সহৃদয় সমালোচকদের ওপর ছেড়ে দিয়ে স্বস্তিবোধ করতে চাই। কবিতা লেখাতেই আমার আনন্দ। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার, বহু পথ হেঁটে, সময়ের বিস্তর বালি ছেনে, আজো মনে হয়, কবিতা লেখা ভালোভাবে শুরুই করিনি, এখন থেকে শুরু করবো। এ আমার কপট বিনয় নয়। কপটতা যেন আমাকে কখনো স্পর্শ না করে, এটাই সবসময় চেয়েছি। হতে পারে, কবিতা ভবিষ্যতে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে; কিন্তু তখনও আমি কবিতার অনুরক্ত পাঠক হয়ে থাকবো।

নিজেকে ব্যক্ত করার অদম্য ইচ্ছা এবং সত্যের সন্ধান একজন লেখকের প্রধান কর্তব্য। সত্য যদি তার নিজের বিরুদ্ধেও যায়, তবু সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া অনুচিত। সর্বোপরি, যে কোনো মূল্যে মনুষত্ব বজায় রাখার সাধনায় অবিচল থাকা একান্ত জরুরি একজন লেখকের পক্ষে। মহৎ সাহিত্যের সাহচর্যে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। কী করে ভুলি প্রাচীন কবির সেই অমোঘ পংক্তি, ''সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই?'' সত্যের অনুরোধে বলা দরকার, জগৎ সংসারে কুটিলতা, মানসিক অন্ধত্ব, সংকীর্ণতা, কলুষতা, নোংরামি, নীচতা কখনো কখনো জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। মানুষের মুখ ম্লান করে দেয়ার লোকের অভাব নেই। বিশ্ব বিরূপ, কিন্তু এই বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যকে অগ্রাহ্য করি কী ভাবে। আছে মৃত্যু, আছে শোক; তবু বেঁচে থাকতে ভালো লাগে, কোনো কিছুরই বিনিময়ে চিরচেনা রৌদ্রছায়াময় পৃথিবী ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। হয়তো এই জীবন একেবারে নিরর্থক নয়। জানি না, নিজেকে সান্ত্বনাবাক্য জানাচ্ছি কিনা।

আহ্ বেঁচে থাকা। এই বেঁচে থাকার জন্যে কত খেসারতই না দিতে হয় আমাদের। নিরিবিলি জীবন যাপন করতে চাই। পরিবারের সদস্যদের জন্যে বাসযোগ্য একটি আশ্রয়, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেয়ার অবকাশ, ভাইবোনদের সঙ্গে মেলামেশার অনুকূল পরিবেশ, ভালোবাসার সান্নিধ্য, কিছু বই এবং সঙ্গীতের রেকর্ড পেলে আমার আর কিছু নাহলেও চলে। অবশ্য নিয়মিত পরিচিত আহার্য এবং লজ্জা নিবারণের মতো গাত্রাবরণ থাকতেই হবে। বেঁচে থাকলে মানুষের সামনে নানা ধরনের প্রলোভন এসে হাজির হয়। প্রলোভনের ফাঁদ পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি, তবে, আজ পর্যন্ত অসৎ উপায় অবলম্বন থেকে নিজেকে দূরে রেখেছি। জীবনের বাকি দিনগুলো সততার সঙ্গে কাটিয়ে যেতে পারলে ধন্য মনে করবো।

সত্যি বলতে কি, আমার মনের মতো সমাজ এদেশে গড়ে উঠেনি আজো। মুক্ত চিন্তাসমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক সমাজ আমার কাম্য। সেরকম সমাজের প্রতীক্ষায় আছি, জানি না দেখে যেতে পারবো কিনা। যে দাঁতাল, স্থূল সময়ে আমরা বাস করছি তার অবসান সহজে ঘটবে বলে মনে হয় না। যদি কোনোদিন হয় তাহলে আমাদের লড়াই একেবারে ব্যর্থ হয়নি, এ-কথা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো স্বীকার করবে।

কালের ধুলোয় লেখা

।। এক ।।

প্রথম মহাযুদ্ধের বারুদের গন্ধ হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার এগারো বছর পর ১৯২৯ সালে আমি সর্বপ্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিলাম পুরনো ঢাকার মাহুৎটুলির এক সরু গলির ভিতর, আমার নানার কোঠাবাড়িতে। কোঠাবাড়ি বলে দিচ্ছে, রুপোর চামচ মুখে নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করিনি। তা না হলেও জন্মের অব্যবহিত পরে মুখে কয়েক ফোঁটা মধু অবশ্যই দিতে পেরেছিলেন আমার নানি। আম্মার মুখে শুনেছি, জন্মলগ্নে আমি আর দশটি শিশুর মতো কান্না জুড়ে দিই নি। আমাকে কাঁদানোর জন্য ধাত্রী এবং নানিকে বেশ কোশিশ করতে হয়েছিল। জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে অনেক কাঁদতে হবে বলেই হয়তো সেদিন কাঁদিনি। তবে আমি কোনওকালেই ছিঁচকাঁদুনে নই। আমার নানা এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন। সেই সুবাদে পেয়েছিলেন দারোগার চাকরি। আমার নানা মুন্সী আফতাব উদ্দিন আহমদ ছিলেন পরহেজগার মানুষ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, ফজরে উঠে আজান দিতেন এবং তেলাওয়াত করতেন কোরআন শরীফ। রোজা বাদ দেননি কখনও। দারোগার চাকরিতে ঘুষ খাওয়ার সুযোগ আছে জেনে সেই আমলে অমন লোভনীয় চাকরি নেননি। তার বদলে কাছারিতে সামান্য কাজ শুরু করেন। বেশি বেতন পেতেন না। যা পেতেন তা দিয়ে মোটামুটি তাঁর সংসার চলে যেত। জীবনে কখনও ধার-কর্জ করেছেন বলে শুনিনি। মাইনে পেয়ে বাড়িতে ঢোকার আগে মহল্লার বিধবাদের প্রত্যেককে কিছু পয়সা দিয়ে আসতেন। বিধবার সংখ্যা নিশ্চয় খুব বেশি ছিল না। আমার নানা ঢাকায় বাড়ি করলেও তাঁকে ঠিক এই শহরের বাসিন্দা বলা যাবে না। কারণ, তিনি জন্মেছিলেন সেকালের ঢাকা জেলার পাড়াতলী গ্রামে (বর্তমান নরসিংদীর রায়পুর থানার একটি গ্রাম)। তাঁর শৈশব এবং কৈশোর সেখানেই কেটেছিল। আমার দাদা ও নানা সহোদর দুই ভাই। দাদা বড়ো, নানা ছোটো। আমার আব্বা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী মুন্সী কলিমউদ্দিন আহমদের চতুর্থ পুত্র। দাদাকে আমি দেখি নি। তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে আমি ভূমিষ্ঠ হই। দাদা, আব্বার মুখে শুনেছি, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ ছিলেন। যদিও তিনি ইংরেজি জানতেন না, বাংলা, আরবি এবং ফারসি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। জমিদারের নায়েব ছিলেন। দাদার প্রতি আব্বার ভক্তি ছিল প্রগাঢ় এবং অবিচল। আব্বা তাঁর পিতাকে একজন ওয়ালীউল্লাহ্ মনে করতেন। দাদা পাড়াতলী গ্রামে শুধু মসজিদ তৈরি করে ক্ষান্ত হননি, তিনি একটি প্রাইমারি ইশ্‌কুলও স্থাপন করেন। আব্বার উদ্যোগে সেটি এখন একটি উচ্চ বিদ্যালয়। এলাকাবাসীর কাছে মুন্সি কলিমউদ্দিন আহমদ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। আমার নানা ইংরেজি শিখেছিলেন। তাঁর একটি টাইপরাইটার ছিল। কতদিন তাঁর টাইপরাইটারের আওয়াজ শুনেছি, সেই শব্দ আজও কানে বাজে। কোনওদিন সেই যন্ত্রটি ছুঁতে সাহস হয়নি, পাছে নানা রেগে যান। নানার আদর খেতেই অভ্যস্ত ছিলাম,

তাঁর অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখার খায়েশ ছিল না। ছোটোখাটো মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের আভা সম্ভ্রম জাগাত সবার মনে। নানা দুই বিয়ে করেন। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বড়ো মেয়ে আমার আম্মা মোসাম্মাৎ আমেনা খাতুন। আব্বা তাঁর শ্বশুরের মতোই দোজবরে। ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি খুব পছন্দ করতেন, তাই পর পরই দুই কন্যাকেই তুলে দেন তাঁর হাতে। অবশ্য মোখলেসুর রহমান চৌধুরী ও মোসাম্মাৎ আমেনা খাতুনের পরিচয় হয় তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর। নিজের বোনের তিন পুত্রকে মানুষ করার দায়িত্ব অর্পিত হয় তেরো বছরের আমেনা খাতুনের ওপর, আমার জন্মের আগেই। তেরো বছরের কিশোরীর পক্ষে এরকম একটি সংসার সামলানো যে কত আয়াসসাধ্য এবং কষ্টকর তা আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু আম্মার মুখে আজ অব্দি কোনও নালিশ শুনিনি। হাসিমুখে দায়িত্ব পালন করে গেছেন সবসময়। নানা জানতেন তাঁর ধৈর্যশীলা, স্বল্পভাষিণী, সুশীলা কন্যা মাতৃহীন তিনটি ছেলেকে কখনও অবহেলা করবে না, কষ্ট দেবে না। নিজের গর্ভজাত সন্তানের মতোই আদর যত্ন করবে। একজন বিপত্নীকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে আম্মার মনে কোনও খেদ ছিল না। অন্তত আমার কখনও মনে হয়নি সে কথা। বড়ো হয়ে লক্ষ করেছি আব্বা ও আম্মার সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। সেই মাধুর্য ফিকে হয়ে যায়নি আব্বার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। আব্বা ছিলেন প্রায় গ্রিক দেবতা জিউসের মতো। তিনি রেগে গেলে আমরা কেউ তাঁর ধারেকাছে ঘেঁষতে সাহস পেতাম না। মারধর করার অভ্যাস তাঁর ছিল না। জীবনে শুধু একবার তিনি আমার কান মলে দিয়েছিলেন। আমার অপরাধ? তখন আমি বালক। মাগরেবের নামাজ পড়ছিলেন আব্বা। আমি দু'একবার তাঁর জায়নামাজের সামনে দিয়ে ছোটাছুটি করেছিলাম। আব্বা এই বেয়াদবি বরদাশত করতে না পেরে আমার কান মলে দেন জোরে। লুকাব না, ভয়ে আমি প্রস্রাব করে দিই। কখনও কখনও তাঁকে আম্মার উপর চটে যেতেও দেখেছি। কখনও কোনও গালমন্দ করতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তবে বিলক্ষণ তর্জন-গর্জন শুনেছি। এমনিতেই তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গুরুগম্ভীর, ক্রোধের সময় তা জিউসের বজ্রনিনাদের মতো শোনাত। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ক্রোধাগ্নি গলে জল। আব্বা আম্মার প্রতি তাঁর অনুরাগ বোধহয় ভাষায়? প্রকাশ করতেন না, করতেন তাঁর নম্র দৃষ্টিতে, মমতাময় আচরণে। আব্বার অনুজ আরিফুর রহমান চৌধুরী। আব্বা তাঁর এই ভাইটিকে খুব ভালোবাসতেন। দীর্ঘকাল দুই ভাই এক সঙ্গে একই বাড়িতে ছিলেন। একান্নবর্তী পরিবার বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়, রান্নাবান্না হত আলাদা আলাদা। পরে দুই ভাইয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় মূলত চাচার কারণে। বাদ-বিসম্বাদ সত্ত্বেও আমাদের দুই পরিবারের সদ্ভাব অটুট ছিল, এখনও আছে। আরিফুর রহমান চৌধুরী আম্মার ছোটো বোন মোসাম্মাৎ মোমেনা খাতুনকে বিয়ে করেন। চাচার একাধিক বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও কেন যে তাঁকে নানা তাঁর ছোটো মেয়ের স্বামী বানাতে রাজি হন তা বহুদিন বুঝতে পারিনি। এর পেছনে ছিল দু'টি কারণ — প্রথমত, ভাইয়ের ছেলে, দ্বিতীয়, ভ্রাতুষ্পুত্রের আবদার। চাচা আমার খালাম্মাকে বিয়ে করার জন্য বায়না ধরেছিলেন। আরিফুর রহমান চৌধুরি ছিলেন শৌখিন এবং বিবাহপটু মানুষ। তিনি তাঁর গায়ের ভয়েলের কুর্তার মতো ঘন ঘন বউ পালটাতেন। আমাকে খালাকে তিনি ত্যাগ করেননি, কিন্তু ভুগিয়েছেন অনেক। খালা মুখ ফুটে কিছু বলতেন না। মনোভার